বাতিদান

আশাপূর্ণা দেবী

বাতির আলোয় নিকটবর্তী স্থান আলোকিত হলেও তার পরবর্তী স্থান অতি ঘোরতর অন্ধকারে মসীলিপ্ত হয়ে থাকে। তেমনি বাস্তবজীবনে যে সকল ব্যক্তির উজ্জ্বল কীর্তি চোখের সামনে আলোকিত হয়ে ওঠে, অনুসন্ধান করলে তাদের অপ্রকাশিত ক্রিয়াকলাপ ভয়াবহ বিভীষিকার সৃষ্টি করে। ভাল ও মন্দ মানুষের জীবনে সমানভাবে অবস্থান করে। ভালটা বাড়লেই মন্দটা বৃদ্ধি পায়। তবে একটা প্রচারিত হয় অন্যটা গুপ্ত থাকে, এই যা।

অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত।

সকালবেলা খবরের কাগজের ভাঁজ খুলে স্তম্ভিত হয়ে গেল লোকে।

রাত্রে নিতান্ত দুঃস্বপ্নের ঘোরেও কেউ ভাবতে পারেনি রাত পোহাতেই এ খবর দেখতে হবে। বিশেষ করে বিচলিত হচ্ছে তারা, যারা গতকাল সন্ধ্যাতেও হেমন্ত সরকারের জোর-গলায় বক্তৃতা শুনেছে।

বেলা তিনটে থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত ঝাড়া তিনঘণ্টা মাঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছেন ভদ্রলোক, কাতারে কাতারে লোক এসে জমেছে, এবং বক্তৃতামুগ্ধ জনসাধারণের শতকরা প্রায় আশীজনই ঠিক করে ফেলেছে তার ভোটটা 'বাতিদান'কেই দেবে।

হ্যাঁ বাতিদান।

ওই প্রতীকই খাড়া করেছিলেন হেমন্ত সরকার তাঁর এবারকার নির্বাচন যুদ্ধে। কিন্তু কোথায় পড়ে রইল বাতিদান, আর কোথাকার কোন্ বাতাসে মিলিয়ে গেল হেমন্ত সরকারের জোরালো গলার রেশ। নির্বাচনী সফর শেষ করবার আগেই এক অজানিত লোকে রওনা হতে হল হেমন্ত সরকারকে।

খবরটার আকস্মিকতা সহ্য হয়ে যাবার পর মানুষটা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হল। অনেকে বলাবলি করতে লাগল, 'এইসব পাগল লোকেরাই নিজের মৃত্যু নিজে ডেকে আনে। ওই ব্লাডপ্রেসার রুগী, আর এই রোদ বৃষ্টি তুচ্ছ করে মাঠে পথে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানো! ইস্!'

যারা হেমন্ত সরকার সম্পর্কে আরও বেশী জানতো, তারা বলতে লাগল, 'এত সফর করে বেড়ানোর কোনও দরকারই ছিল না। যে অঞ্চলে রণক্ষেত্র

নির্বাচন করেছিলেন হেমন্ত, সেখান থেকে তাঁর বিজয় নিশ্চিত ছিল।' সত্যি, ওখানে 'সরকার বাড়ি' হল চিরকেলে জমিদার বাড়ি। গরীব-দুঃখীরা বলত 'রাজবাড়ি'!

হেমন্ত সরকারের বাপ-ঠাকুর্দা প্রজাপীড়ক জমিদার ছিলেন না, প্রজাবৎসল ছিলেন। দানধ্যান পুণ্য-কার্য দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি করে চিরকাল তাঁরা প্রজানুরঞ্জনই করে গেছেন।

এখন অবশ্য 'জমিদার' শব্দটা নেই, জমিদারিও নেই, কিন্তু সরকার বাড়ির প্রতি সম্ভ্রমটা সকলের আছে। কাজেই ওখানে হেমন্ত সরকারের হার হবার কোন আশঙ্কাই ছিল না।

'তাছাড়া'—বলতে লাগল সবাই, 'অজাতশত্রু ব্যক্তি! এ যুগে অমন খাঁটি মানুষ দুর্লভ।'

দলে দলে তাই শোক প্রকাশ করতে আসতে লাগল সবাই হেমন্ত সরকারের কলকাতার বাড়িতে। যেখানে শর্বরী পাথর হয়ে গিয়ে বসেছিল শোক করতে ভুলে। গতকালও বেরোবার সময় যাকে অনুরোধ করেছিলেন হেমন্ত সরকার, 'চল না ঘুরেই আসবে।'

শর্বরী যেতে চায়নি।

বলেছিল, 'নাঃ তোমার ওই ভোট ভিক্ষের আবেদন-নিবেদন শোনবার বাসনা আর নেই আমার! আর এই রোদে ওই বত্রিশমাইল পথ! বাব্বাঃ!'

হ্যাঁ, রোদেই বেরোতে হচ্ছিল হেমন্তকে। কারণ পাড়াগাঁয়ের দিকে রাতের অন্ধকার নামার আগেই বক্তৃতা শেষ করতে হয়। মাঠে-ঘাটে দাঁড়িয়ে চিৎকার! তিন ঘণ্টা চেঁচানি, আর ত্রিশ-বত্রিশ মাইল মোটরযাত্রার সময় হাতে নিয়ে বেরোতে হলে রোদ ছাড়া গতি কি!

শর্বরী বলেছিল, 'ডাক্তারের হুকুম একেবারে উড়িয়ে দিয়ে এভাবে বেপরোয়া রোজ অত্যাচার চালাচ্ছ। খুব ঠিক হচ্ছে?'

হেমন্ত হেসে বলতেন, 'দেখনা, আর এই কটা দিন বৈ তো নয়—'

সেই কথাটাই শুধু পাথর হয়ে যাওয়া মানুষটার মনের মধ্যে ওঠা-পড়া করছিল। 'কটা দিন!' কোন একটা ভয়ংকর হিংস্র 'ক্ষণ' উদ্যত হয়ে ছিল, ওই কথাটা উচ্চারিত হওয়ার সময়।

অলক্ষ্যে হেসেছিল কোন দুষ্টগ্রহ!

প্রথম দিকে চৈতন্যলুপ্তির একটা অন্ধকার শান্তি অনুভব করতে পেরেছিল শর্বরী, কিন্তু আর সে শান্তিটুকু বজায় রইল না।

লোকের ভিড়ে বাড়ি ভরে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে। শর্বরীকে সান্ত্বনা দেবার

জন্যে দুর্বার হয়ে উঠেছে হেমন্তর গুণগ্রাহী শোকাহত অনুরক্তের দল।

বিরাট দল।

হেমন্ত সরকার তো কম জনপ্রিয় ছিলেন না। এই জনতার মাঝখানে মূর্ছাতুর হয়ে পড়ে থাকার উপায় আছে? শর্বরীকে উঠতে হল, লোকের ঝড় আর শোকের ঝড়ের মাঝখান থেকে হেমন্ত সরকারের উপযুক্ত শেষকৃত্যের নির্দেশ দিতে হল। ওর নিজের যে কতখানি গেল, সে আর অনুভব করতে পারল না, এত লোকের 'যাওয়া'র ওজন দেখে।

তবু ক্রমশঃ অবস্থা শান্ত হল বৈকি।

জোয়ারের জল সরে গেল।

শোকাহত বহিরাগতের দল বিদায় নিল, শর্বরী ভাবতে চেষ্টা করল হেমন্ত মারা গেছেন। ভেবে বুঝতে হবে, নইলে কিছুতেই তো বিশ্বাস হচ্ছে না।

এত কাণ্ডতেও নয়।

তারপর বড় ভাগ্নেকে ডেকে বলল, 'আমি চন্দনপুর যাবো।'

মামী মান্যে বড়, কিন্তু এদিকে বয়সে ছোট, তাই সম্ভ্রমের ভাবটা বেশী রাখতে হয়। নিখিলরঞ্জন মাথা নীচু করে বলল, 'আর সেখানে গিয়ে কি হবে?'

শর্বরীও মাথা নীচু করল, ভেঙেপড়া চোখ দুটোকে অপরের চোখের আড়াল করতে। আস্তে বলল, 'জায়গাটা একবার দেখব।'

'কিছুদিন যাক না?'

'যত দিন যাবে, ততই তো অনেকের পায়ের ধুলোয় সব ধুলো চাপা পড়ে যাবে।'

নিখিলরঞ্জন গলা ঝেড়ে বলল, 'চন্দনপুরের পুরনো কাছারিবাড়িটা প্রাইমারি স্কুল করে দেওয়া হয়েছে তা তো জানো, কোথায় গিয়ে উঠবে? বরং ক'দিন পরে যদি চুয়াপুরে গিয়ে সেখান থেকে যেতে চাও—'

'চুয়াপুরেই' সরকারদের নিজ-বাড়ি। চন্দনপুরের পাশেই। সে বাড়ি এখনো দাতব্যে চলে যায়নি। পুরনো আসবাব আর পুরনো স্মৃতি নিয়ে অবিকল বসে আছে। নিখিল ভাবল, সেই স্মৃতিমণ্ডিত বাড়িতে গিয়ে বরং দু'দিন থাকতে চায় তো থাকুক গিয়ে।

একদা ওই বাড়িতে তো নতুন বৌ হয়ে এসেছে শর্বরী, ওই বাড়িতেই হয়েছে তার ফুলশয্যা।

নিখিল তো সবই জানে।

কিন্তু শর্বরী ভেঙে পড়ছে, শর্বরী আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। তাই এতক্ষণের অবিচলতার ভান বিসর্জন দিয়ে শতধা বিদীর্ণ হয় শর্বরী, 'চুয়াপুরে যাবো নিখিল, পরে যাবো। আজ একবার সেখানটা দেখে আসি, যেখানে দাঁড়িয়ে শেষ কথা বলেছিলেন, শেষ নিশ্বাস—'

নিখিল নিশ্বাস ফেলে বলে, 'যেতে বারণ করছি না, তবে না গেলেই বোধহয় ভাল হতো। ওতে আরও কষ্টই হবে।'

শর্বরী চোখ তুলে চায়, লাল লাল ফুলো ফুলো চোখ, 'আর কত কষ্ট হওয়া সম্ভব নিখিল? তেমন কষ্ট আছে কোথাও? যে কষ্টে মানুষ মরে যায়?'

নিখিল মাথা নীচু করে বলে, 'চল তবে। ড্রাইভারকে বলি। গেলে এই সকালের দিকেই বেরোনো ভাল, বিকেলের মধ্যে ফেরা যাবে। বেলা হলেই তো রোদ—'

'হ্যাঁ রোদ!' শর্বরী অন্যমনস্কের মত বলে, 'রোদ বলেই তো গেলাম না। বললাম আমি কেন যাবো, আমার কি দায়? আচ্ছা নিখিল, সেই সেকালের সতী স্ত্রীরা এরকম বলত না, না? তারা স্বামীর সঙ্গে বনেজঙ্গলে 'সর্বত্র' যেত—'

'এসব কথা কেন চিন্তা করছ? রাশি রাশি লোক এসে বলে গেল শুনলে না, তুমি তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী। বলল তাঁর আরব্ধ কাজ তোমাকেই করতে হবে।'

শর্বরী শিথিলভাবে বলে, 'আমাকে একবার নিয়ে চল নিখিল, নিজের চোখে দেখে আসি তিনি সত্যি নেই, সত্যি আর কোথাও গিয়ে তাঁকে দেখতে পাব না, তারপর দেখো কত শান্ত হয়ে যাবো।'

নিখিল হতাশ-ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, 'নিজের চোখে তো সবই দেখলে!'

শর্বরী কুণ্ঠিত ম্লান ভাবে বলে, 'দেখলাম! তবু কি মনে হচ্ছে জানো নিখিল, সেই দেহটা যেন আর কেউ, যেন আমার অচেনা কেউ। আস্ত সত্যিকার যে মানুষটা সেদিন হাসতে হাসতে চন্দনপুর চলে গেল, তাকে বোধহয় সেখানে গেলেই দেখতে পাবো। বুঝছি সবই আমার পাগলামি! তোমায় জ্বালাতন করা! কিন্তু সেই ছোটবেলা থেকে তুমি তো আমার কত দৌরাত্ম্যি সহ্য করেছ!'

'থাক ওকথা বলছ কেন!' নিখিল বলে, 'আমার কিছুই নয়। তোমার কষ্টের জন্যেই—'

অগত্যাই প্রস্তুত হতে হল নিখিলকে।

কিন্তু একজন নিষ্ঠুর রসিক কোথায় বসে যে সব কিছু অপ্রস্তুত করবার তালে থাকেন! নইলে গাড়ি চন্দনপুরের কাছাকাছি পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ বিগড়ে গিয়ে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে কেন?

ড্রাইভারটা সাধ্যমত চেষ্টা করে বলল, 'হবে না।'

হবে না!

তাহলে হবে-টা কি? হবে। রেল স্টেশনে পৌঁছতে পারলে কিছু সুরাহা হবে।

নিখিল বিপন্ন হয়ে চারিদিকে তাকায়, কোথাও তো জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই, চারিদিকে শুধু খাঁখাঁ মাঠ। কাকেই বা জিগ্যেস করবে স্টেশনটা এখান থেকে কত দূর।

ড্রাইভারটা বলল, 'আমি দেখছি দাদাবাবু। এখন গাড়িটা ঠেলে একটু ছায়ার দিকে নিয়ে যেতে পারলে—! স্টেশনে গিয়ে পড়তে পারলে যা হয় একটা ব্যবস্থা হবে। একটা সাইকেল রিক্‌শ যদি পাই। আপনি মাকে নিয়ে তাহলে ট্রেনে ফিরে যাবেন। গাড়ির ব্যবস্থা পরে হবে।'

অগত্যা তাই।

দুজনে ঠেলে ঠেলে কোনমতে গাড়িখানাকে একটা গাছের ছায়ায় রেখে ড্রাইভার চলে গেল।

শর্বরী ধূসর দৃষ্টি মেলে বসে রইল চুপচাপ। যা কিছু ঘটছে, তার সঙ্গে যেন ওর কোনও যোগ নেই, ও যেন হঠাৎ এই পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এরা শর্বরীর জন্যে যা ব্যবস্থা করবে, সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই শর্বরীর।

অথচ ক'দিন আগে যদি এমন হতো?

যদি গাড়িতে তার ওই বয়সে বড় গম্ভীরপ্রকৃতি ভাগ্নে না থেকে সেই মানুষটা থাকতো! যে এই গাড়ি-খানার মালিক!

কী মুখর হয়ে উঠত শর্বরী, এমন একটা পরিবেশে! হয়তো হৈ হৈ করে ওই গাছপালাগুলোর উপর হানা দিত কাঁচা কুল কি ডাঁসা পেয়ারার সন্ধানে। হয়তো তার 'লেকে'র জলে অভ্যাস করা সাঁতার কাটার বিদ্যাটা কাজে খাটাতে চাইতো দূরের ওই দীঘির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হয়তো এই গাড়ি ঠেলায় সেও অংশ নিত কোমরে আঁচল জড়িয়ে। আর সেই পরম স্নেহময় একজোড়া চোখ কৌতুকে আর প্রশ্রয়ে মোহময় হয়ে উঠতো!

তাই তার সঙ্গে যে কপট ভর্ৎসনা থাকতো তাকে আমলও দিত না শর্বরী। কিন্তু কপট ছাড়া সত্যিকার ভর্ৎসনা কি কোনদিন দেখেছে শর্বরী?

না, শর্বরীর জন্যে ভর্ৎসনা ছিল না। ছিল শুধু উদার অগাধ এক স্নেহ-সমুদ্র!

নিখিল একবার শর্বরীর ওই ভাবশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে বলে, 'একটু একলা বসতে পারবে? দেখতাম আশেপাশে যদি কোথাও ডাব পাওয়া যায়—'

'ডাব? ডাব কি হবে?' চমকে বলে শর্বরী।

নিখিল মৃদুগম্ভীর হাস্যে বলে, 'খাওয়া হবে আর কি হবে। কেন, তোমার তেষ্টা পায়নি? আমার তো খুব পেয়েছে।'

নিখিলের তেষ্টার কথা শুনে একটু চঞ্চল হল শর্বরী, একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'ফ্লাস্কে জলও আনা হয়নি।'

'আচ্ছা দেখছি, দীঘির ওদিকে যেন দুটো ছেলে—'

হাতছানি দিতে হল না, বোধকরি অচল একখানা গাড়ি দেখে তারা নিজেরাই এগিয়ে এল। চাষীর ঘরের ছেলে সন্দেহ নেই, খালি গা খালি পা। কিন্তু ওদের মধ্যেকার ওই ফরসা ছেলেটাকে কবে কোথায় দেখেছে শর্বরী! যেন কিছুতেই মনে করতে পারা যাচ্ছে না, অথচ ভয়ানক একটা আলোড়ন তুলে ব্যাকুল করে দিচ্ছে।

ঝাপসা কুয়াশার স্তর সরিয়ে স্মৃতির সমুদ্র হাতড়াতে থাকে শর্বরী—কোথায় দেখেছে, কোথায় দেখেছে! এই চাষীর ঘরের ছেলেটাকে কোথায় দেখা সম্ভব শর্বরীর!

আর যদি বা দেখে থাকে, কেন ভুলে যায়নি? কেন, শুধু 'কোথায় দেখেছে' এইটুকু মনে পড়াবার জন্যে এমন তীব্র একটা যন্ত্রণা অনুভব করছে?

কিংবা কিছুই নয়। চাষীর ঘরে এমন একখানি কোমল লাবণ্যময় মুখ আর ফরসা রং দেখতে পাওয়াটা আশ্চয্যি বলেই হয়তো এমন মনে হচ্ছে শর্বরীর। কিন্তু ভুরুর ওপরকার ওই লাল জড়ুলটা?

ফরসা ছেলেটা চুপ করে আছে। যে ছেলেটার রং কালো আর মুখ লাবণ্যহীন সেই ছেলেটাই কথা বলছে তড়বড় করে। নিখিলের প্রশ্নের উত্তরেই বোধহয় বলছে, 'ডাব? এই গোপলাদের ঘরে তো গাদা গাদা! 'মিছরিপানা নারকোলের' বাগানই আছে ওদের। রাজাবাবু যখন আসত, এক লপ্তয় তিনটে-চারটে ডাব খেত—'

'কে? কে? কে কখন আসত?'

গাড়ির দরজা খুলে নেমে এল শর্বরী। আর এই চার দিনের পর প্রথম গলার স্বর শোনা গেল ওর। কিন্তু সে স্বর কী কর্কশ কী বিশ্রী ভাঙা ভাঙা।

নিখিল হঠাৎ পকেট থেকে একটা টাকা বার করে ছেলে দুটোকে প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে, 'চল চল, দেখি কোথায় তোদের মিছরিপানা। কেটে খাওয়াতে পারবি তো? মামী বোসো তুমি, দেখি কোথায় ওদের নারকেল বাগান।'

কালো ছেলেটা হি হি করে হেসে ওঠে, 'বাগান থেকে পেড়ে খাবে নাকি? কাঁদি কাঁদি কাটা মজুত আছে না ওদের ঘরে? ব্যাপারীরা নিয়ে যায়। শুধু সবসেরা গাছটার ডাব বেচতে মানা, গোপলা আর গোপলার মা খাবে, রাজাবাবুর হুকুম। তা এরপর আর কে হুকুম মানছে! রাজাবাবু তো—'

হঠাৎ চিরগম্ভীর চিরশান্ত নিখিলরঞ্জন অদ্ভুত একটা কাজ করে বসে। হয়তো বা জীবনে যা না করেছে এমন কাজ।

ঠাস করে ছেলেটার গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে দুটো ছেলেকেই ধাক্কা মেরে গজখানেক তফাতে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, 'কাজের বেলায় নেই, খালি বাজে কথা! তেষ্টা পেয়েছে, দুটো ডাব কিনবো, তা নয়—যা ভাগ্, চাই না তোদের মিছরিপানা! যা যা শীগগির!'

কিন্তু ততক্ষণে শর্বরী ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই ঘটনার ওপর। যে চোখ এতক্ষণ ধূসর কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে একটা বন্ধ দরজার গায়ে মাথা কুটছিল, সে চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। বুঝি হঠাৎ একটা প্রবল ধাক্কায় খুলে পড়েছে সেই বন্ধ দরজা, বুঝি ভয়ংকর যে ব্যাকুলতা তার সমস্ত স্নায়ুকে তোলপাড় করছিল, সে ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসবে সেই দরজা দিয়ে।

'রাজাবাবু কে?'

পাথরকঠিন মুখ থেকে একটা ভয়ংকর কণ্ঠের তীব্র প্রশ্ন উচ্চারিত হয়। বাক্‌পটু ছেলেটার প্রতি নয়, নির্বাক্ ছেলেটার প্রতি।

সাদা হয়ে যায় ছেলেটা এই তুচ্ছ প্রশ্নে। সন্দেহ থাকে না ডাব কেনাটা এদের আসল উদ্দেশ্য নয়, এটা ছল। সন্দেহ থাকে না ভয়ানক একটা শাস্তির মুখে পড়তে হবে তাদের।

মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না তার,

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মুখ নীচু না করে—উঁচু করে।

হ্যাঁ মুখটা উঁচু করে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে সে ওই পাথরে তৈরী চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে।

উত্তর ও দিতে পারে না, দেয় কালো ছেলেটাই, 'গোপলা ভীতু, কথা বলতে পারে না। রাজাবাবু কে, তাও জানো না? যে জনা বাতিদানের জন্যে ভোট সাধতে সাধতে মুখ দিয়ে ফেনা ভেঙে মরে গেল। খপর কাগজে ছবি উঠল—'

'মামী, উঠে এস।'

নিখিল এসে প্রায় দুজনের মাঝখানে দাঁড়ায়, 'কতকগুলো বাজে কথা শোনার দরকার নেই।'

কিন্তু পাথর হয়ে গিয়েছে বলে কি সত্যিই সমস্ত অনুভূতি চলে গেছে শর্বরীর? তাই একটা মানুষের 'মুখ দিয়ে ফেনা ভেঙে' মরার বর্ণনাতেও কাতর হয় না, বিচলিত হয় না।

বরং হাসে।

কিরকম করে যেন হেসে উঠে বলে, 'দরকার নেই, না? ঠিক বলেছ! দরকার নেই! যা যা তোরা পালিয়ে যা। চল নিখিল, আমরাও পালাই।'

কিন্তু ওরা পালাবার আগে ছেলে দুটোই পালায়, তীরবেগে।

'এই যে মিস্ত্রী—'

সাইকেল রিক্‌শটা কখন আসছিল কে জানে, একেবারে সামনে আসতে নজরে পড়ে। ঝুপ করে ড্রাইভার নামে, সঙ্গে সঙ্গে মোটর মেকানিক। স্টেশনের ধারে বাসেরও স্ট্যাণ্ড। সেখান থেকে ধরে এনেছে মিস্ত্রীটাকে।

গাড়ি ঠিক হতে বিলম্ব হয় না।

নিজ কৃতিত্বে মুগ্ধ ড্রাইভার ছোকরা গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলে, 'চলুন দাদাবাবু। খুব ভাগ্যে সহজে মিটে গেল কাজটা—'

'ওদিকে নয় জিতেন, গাড়ি ঘুরিয়ে নাও।'

এই শান্তকণ্ঠের নির্দেশে চমকে পিছন দিকে তাকায় জিতেন। বিনীত নিবেদন করে, 'সময় তো এখনো অনেক রয়েছে মা, এখুনি পৌঁছে যাব।'

'না জিতেন, সময় আর নেই! তুমি ফিরে চল।'

'কি বলেন দাদাবাবু, ফিরেই যাব?' জিতেনের কণ্ঠে হতাশা।

অনেক চেষ্টায় লোকটাকে রাজী করিয়ে এনেছিল, মাকে চন্দনপুরে নিশ্চিত ঘুরিয়ে আনতে পারবে, এই আশায়।

কিন্তু সব ভেস্তে গেল!

বড়লোকের মতিগতি বোঝা দায়। এই একেবারে অস্থির হয়ে ছুটে এলেন, আবার আধঘণ্টার মধ্যেই মেজাজ বদলে গেল!

তবু আর একবার বলল সে, 'বেলাবেলিই ফিরতে পারতাম দাদাবাবু!'

নিখিল হাত নেড়ে ইশারায় জানাল দরকার নেই। অগত্যাই গাড়ি উলটোমুখো চলতে লাগল।

তিনটে মানুষই স্তব্ধ।

এমনি স্তব্ধ হয়েই আবার ফিরে গিয়ে সেই এক শূন্যতার প্রাসাদে আশ্রয় নেবার কথা। কিন্তু পথের মাঝখানেই হঠাৎ এই অবিচ্ছিন্ন স্তব্ধতাকে চিরে পাথরের পুতুল কথা কয়ে উঠল। বোধকরি হেসে উঠেই বলল, 'নতুন যখন বিয়ে হল, বুঝলে নিখিল, তখনও দিদিশাশুড়ী বেঁচে। তোমাদের কর্তামা আর কি! তুমি আর কী না জানো! তা আমাকে কাছে ডেকে বসিয়ে তোমাদের সেই কর্তামা, তাঁর কর্তার কথা নিয়ে অনেক সব মজার মজার গল্প বলতেন! খুব নাকি দাতা মানুষ ছিলেন!

একদিন দুষ্টুলোকেদের তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায়ের নানা ফন্দি-ফিকিরের গল্প করতে করতে বলেছিলেন, 'যে যখন পারতো কোন একটা রোগা হ্যাংলা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসে মাথা চুলকে বলতো, কর্তাবাবু, রাজার নাতি ভিখিরির নাতির মতন মানুষ হবে?'

তোমাদের কর্তাদাদু বলতেন, 'দূর বেটা উল্লুক, তাই কখনো হয়? কাছারিবাড়ি থেকে নাতি, নাতির মার খোরপোশের টাকা লিখিয়ে নিয়ে যা, আমি হুকুম দিয়ে দিচ্ছি।'

শুনে তোমাদের কর্তামা এক এক দিন খুব রেগে গিয়ে বলতেন, 'যার খুশি সে খোরপোশ লিখিয়ে নিয়ে যাবে? প্রমাণের দরকার নেই?' কর্তা রাগ দেখে মজা পেয়ে হাহা করে হেসে উঠে বলতেন, 'বেটা আপনার গালে আপনি চুনকালি মেখে এসে দাঁড়িয়েছে, ওইটাই প্রমাণ! আশ্চয্যির কী আছে? প্রজাদের ঘরে অমন দু'দশটা রাজার নাতি প্রতিপালিত হয়েই থাকে!'

গল্পটার মানে বুঝতে পারিনি, হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম। দিদিশাশুড়ী হেসে বলেছিলেন, 'বি. এ., এম. এ. পাসই করেছিস নাতবৌ, বুদ্ধির বালাই মাত্তর নেই। তুই একটা হাঁদা!' কতদিনের পুরনো গল্পটা হঠাৎ কি রকম মনে পড়ে গেল।'

নিখিল এক মিনিট নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকে বলে, 'একেবারে নিঃসংশয় হবার মত কি হয়েছে?'

শর্বরী প্রায় শব্দ করে হেসে উঠে বলে, 'নাঃ, হবে আর কি! কিন্তু কী বললে? 'নিঃসংশয়'! তুমি তো বেশ ভাল বাংলা জানো! আমিও আগে জানতাম! আচ্ছা এসব গল্প তুমি শোননি? তোমার তো মামার বাড়ি!'

'শুনেছি বৈকি!' নিখিলরঞ্জন গম্ভীরকণ্ঠে বলে, 'কিন্তু লোনা জলের স্বাদকে সমুদ্রের শেষকথা বলে ভাবিনি! তার বিশালতা গভীরতা, সব কিছু নিয়েই সমুদ্রকে উপলব্ধি করেছি।'

গাড়ি খানিকক্ষণ চলতে থাকে।

আবার হঠাৎ নীরবতা ভেঙে বলে ওঠে শর্বরী, 'আর যে যুগের ওই লোনা স্বাদটাই শেষকথা, সে যুগের মানুষ কী ধরে দাঁড়াবে বল তো নিখিল?'

নিখিল নিরুত্তর দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে।

'জানি এ কথার উত্তর তোমার কাছে নেই', শর্বরী বলে, 'হয়তো এ যুগে কারো কাছেই নেই। কিন্তু মজা দেখেছ জগতে অকারণ কত কীই ঘটে! হঠাৎ এই মাঠের মধ্যে গাড়িটা বিগড়ে যাবার কী দরকার ছিল বল তো? এটা না হলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কার কি লোকসান হতো?'

[লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬৯]